প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা- উনিশ শতকের বাংলা ঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক পটভূমি-সাহিত্যে নারী পরিসর সন্ধানের সূত্রপাত ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্য

সময়টা ছিল উনিশ শতক। বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সেই সময়। মুষ্ঠিমেয় কিছু শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন নারীমুক্তির প্রতিষ্ঠায়। এর প্রভাব নারীসমাজের উপর পড়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খুব কম সংখ্যক হলেও নারীদের চিঠিপত্র প্রকাশিত হত নিজেদের অধিকার সচেতনতা নিয়ে। নবজাগরণের সূচনা পর্বের অনেক আগেই রাসসুন্দরী দেবী নিজের চেষ্টায় অক্ষর আয়ত্ত করেছিলেন 'চৈতন্যভাগবত' পড়বার বাসনা নিয়ে। এমন অনেক অনামা নারী হয়তো ছিলেন যাদের নাম ইতিহাসে নেই অথচ নিভৃতে বসে তারা নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের নায়িকা সুবর্ণলতা বা রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পের উমার মতো তাদের লেখা হয়তো হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সুবর্ণলতার মা সত্যবতীর কথা। সত্যবতী বিনা দ্বিধায় স্বামী সন্তানদের ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল নিজস্ব একটি ঘরের সন্ধানে। সত্যবতী কাশীতে গিয়ে স্কুল শিক্ষিকার চাকুরি নেয়। ঊনবিংশ শতকের নারীজাগরণের এক সার্থক দৃষ্টান্ত আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী। সত্যবতীর সেই ঘরের সন্ধান আজও অব্যাহত। যুগ বদলে যাচ্ছে। কিন্তু নারী সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লঘু ধারণা আজও বদলায়নি। মেয়েরা আজও লড়াই করে চলেছে নিজস্ব একটি ঘরের জন্য। নিজেদের অধিকার নিয়ে আজ মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠছে। প্রতিবাদ জানাচ্ছে নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এমন একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। তারা জানত এই অন্যায়-অত্যাচার নারীজাতির কাম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্বমাতৃকারা যে আলোকবর্তিকা জ্বেলে গিয়েছিলেন সেই আলোর পথ ধরে মেয়েরা এগিয়ে চলেছে অনন্ত আগামীর দিকে। এই সচেতনতার সূচনা হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের মধ্য দিয়ে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।[১]

সব দেশের সমাজেই 'নারী' সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন; তারা প্রান্তিকায়িত অপর। সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্য নিয়েই নারীবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। নারীর মর্মবেদনা ভাষাহীনতা ভেদ করে উচ্চারণের আলোয় জেগে উঠেছে। পুরুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কৌশল সে নিজেই আয়ত্ত করেছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ, ইংরেজদের গৃহযুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব প্রভৃতির ফলে পুরুষদের অর্জিত নতুন নতুন অধিকারের সঙ্গে নারীর মৌলিক অধিকার নিয়ে দাবি ওঠে। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভোটাধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সময় থেকেই নারীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখা যায়। নারীর জীবনের

বস্তুভিত্তি এবং লৈঙ্গিক চিহ্নায়ন কীভাবে পরস্পরবিরোধী এ বিষয়ে চিন্তাবিদরা সচেতন হন।

ভারতবর্ষে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ রাজত্ব ও পশ্চিমী সংস্কৃতি ও দর্পণের সূত্রপাতের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। সেই সময় ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান ও বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কম থাকায় আন্দোলনের মূল্যায়ন করা সহজ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষদের লেখা থেকে এবং অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রচনা থেকে সেই সময়কার নারীর অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার প্রভাব বাংলার সমাজ এবং সংস্কৃতির উপর পড়েছিল। বাংলার সমাজে মেয়েদের অবস্থান চিরকাল অবহেলিত। পুরুষ শারীরিক ক্ষমতার জোরে চিরকাল শাসন করে এসেছে মেয়েদের। পুরাণ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত যে নারী চরিত্রগুলি রয়েছে সেখানেও দেখা যায় নারী পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতা। নারীর পরিস্থিতি খুব সম্মানের ছিল না সে যুগে। তবে পাশ্চাত্যের নারীদের তুলনায় ভারতীয় নারীদের অবস্থান অনেক পশ্চাতে ছিল কারণ সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শে ভারতের নারীরা তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

> নারীর পক্ষে অমর্যাদাকর বিভিন্ন প্রথার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও সামাজিক রক্ষণশীলতাকে সহজে দায়ী করা যায়। সমাজ শ্রেণিগত বৈষম্য ও জাতিগত বৈষম্যে জর্জরিত ছিল। এই সব কারণে মহিলাদের নারকীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হত। এই প্রেক্ষিতে কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারেনি যার ফলে পলাশীর যুদ্ধ আরও গভীর অর্থনৈতিক শোষণের পথ সুগম করে যার ফলে ভারতীয় সমাজের সমস্ত কাঠামো কোনও পুনর্গঠনের সুযোগ না দিয়েই ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ নারীর দুঃখ কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তোলে।[২]

কার্ল মার্কসের মতে, ভারতে বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ইতিহাসের অসচেতন মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেন ভারতকে কাঁচামাল যোগানকারী দেশ হিসেবে দেখালেও বুর্জোয়া সামাজের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা ও সমাজিক অধিকার ভারতীয়দের সজাগ করে তুলেছিল। এই সজাগতাকেই আন্দোলনের রূপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলেন রাজা রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছিলেন—

> ভারতের আধুনিক যুগের প্রবর্তন করে গেছেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন জন্মেছিলেন সেই অন্ধযুগে, যে যুগে সামাজিক আচার-বিচারে, রাষ্ট্রীয় চেতনায় এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন সৃষ্টির উদ্যম অদমিত। অভ্যাসের দাস হয়ে যখন আমরা ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে নিজেদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে বসে আছি। আত্মবিস্মৃতির দৈন্য থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আপসহীন, বন্ধনহীন অন্তরের শক্তি দিয়ে দেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতে হবে যুগের পটভূমিতে। উনিশ শতকের নবযুগচেতনা বাংলাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই আধুনিকতার অভিমুখে বাঙালির যাত্রা শুরু হয়। প্রচলিত অমানবিক রীতিনীতি দূর করে এক কলুষমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য শুরু হয় নানা আন্দোলন। এই নবজাগরণ তিন ধরনের আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল— ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন জাগে মানুষের মনে। ভারসাম্যচ্যুত বাংলার সমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মধ্যে নানা বিকৃতি প্রবেশ করেছিল।

> ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম অনেকটা আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠায় তার মধ্যে নানারকম বিকৃতির প্রবেশ ঘটে। চড়কের বিভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গাপূজার সময় বাইজি এনে মদ মাংস খেয়ে ফুর্তি করা ('তত্ত্ববোধিনীর' মতে এই তিনদিন পাপের স্রোত প্রবাহিত হত), রাসযাত্রার সময় আমোদ প্রমোদ, মাহেশে স্নানযাত্রার সময় মেয়েমানুষ নিয়ে চূড়ান্ত হৈ হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে দলে তামাসা দেখতে আসা, শাক্তদের বীভৎস কদাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার এবং অত্যাচার, তারকেশ্বরের মহন্তের 'স্বীয় ধর্ম কর্ম সংস্থাপনার্থ' বেশ্যা রাখা, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউর—সবই ধর্মের নাম নিয়ে চলত, এবং কলকাতায় বাংলার হঠাৎ নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদাতা, বাইরে ঠাঁট বজায় থাকলেও সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শতাব্দীর সূচনা থেকেই অন্তত কলকাতা অঞ্চলে নিষ্ঠা ও ভক্তির অভাব ফুটে উঠেছিল।[৪]

ঔপনিবেশিক প্রশাসন নিজেদের স্বার্থে ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দেয় যাতে তারা অফিস আদালতের কাজকর্ম চালাতে পারে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বাঙালির চিন্তাজগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এল। শুরু হল আত্মসমীক্ষণ।

> পশ্চিম থেকে আধুনিকতার যে বার্তা এদেশে এসে পৌঁছেছিল তার কেন্দ্রে ছিল শিক্ষার ধারণা। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে 'সভ্য ইংরেজ'দের যে অভিযোগগুলো ছিল— যেমন যুক্তিহীনতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, অবৈজ্ঞানিকতা ইত্যাদি— সবকটিই সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল শিক্ষার অভাবের সঙ্গে। পশ্চিমী উন্নতি, উৎকর্ষের গুণগ্রাহী ভারতীয় মনে এই বিশ্বাস প্রায় বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে তার পরাধীনতা কোনও আকস্মিক রাজনৈতিক ঘটনাসাপেক্ষ নয় তা যেন তার স্বভাবসিদ্ধ, চিরন্তন। তবে সময়টা যেহেতু ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনারও সেহেতু কোনও দুর্বলতা বা অভাবকেই স্বাভাবিক বা অনিবার্য মেনে নেওয়ার উপায় ছিল না। জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাক্ শর্তই ছিল এর পরিবর্তনীয়তা প্রমাণের। অতএব মুক্তির সাধনার প্রথম ধাপ ছিল 'শিক্ষার সাধনা'।[৫]

পশ্চিমের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে পশ্চিমেও স্ত্রী-স্বাধীনতার সূচনা হয়েছিল শিক্ষার মধ্য দিয়ে। কারণ শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দেয়, চিন্তা করতে শেখায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই পশ্চিমের চিন্তাশীল মহলে স্ত্রী-স্বাধীনতার সচেতনতা লক্ষ করা যায়। তবে এর তোড়জোড় শুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। মেরি উলস্টনক্রাফটের 'vindication of the rights of women' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেরি মনে করতেন নারী-পুরুষের যুক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতার অভাবেই হীনমন্যতা গ্রাস করে নারীজাতিকে। মেরি চেয়েছিলেন নারীপুরুষের সমপর্যায়ের বন্ধুত্ব, সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুরুষ ও নারীকে মনুষ্যত্বের পূর্ণমর্যাদা দেবে। উলস্টনক্রাফটের মতে তাই পুরুষের মত নারীরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও লক্ষ করা যায় যে নারীর অবস্থান সমাজে মধ্যযুগীয় সমাজের মতই ছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজে সংকীর্ণ ধারণা ছিল। সমাজের চোখে মেয়েরা ছিল পুরুষের প্রয়োজন এবং প্রজননের যন্ত্র। মেয়েদের যে স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে এবং শারীরিক চাহিদা শুধু পুরুষদের একার কাম্য নয়। নারীরও শারীরিক প্রবৃত্তি স্বাভাবিক এসব কথা উপলব্ধি করার মত মানসিক গঠন তখন মানুষের ছিল না। সমাজ নামের এক বিশাল পাথর বাঙালির মানসিকতাকে জড় করে রেখেছিল। যে পুরুষসমাজ নারীকে দাবিয়ে রেখেছিল সেই সমাজেরই কিছু চিন্তাশীল মানুষ অনুভব করেছিলেন নারী সমাজকে উন্নত করে তুলতে না পারলে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কিছু রচনা সেদিন চিন্তাশীল বাঙালির মনে যুগপ্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি সংশয় এবং প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।

> অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ বা ঊনবিংশ শতকের সূচনায় যে নতুন চিন্তাভাবনা পশ্চিমের সমাজকে আলোড়িত করেছিল, বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণি তাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজি শিক্ষায় সদ্যশিক্ষিত ছাত্রসমাজে এই সব বইয়ের কী বিপুল চাহিদা ছিল, তা বোঝা যায় একটি মাত্র তথ্য থেকে ঃ টমাস পেইনের বই কলকাতার বাজারে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হত। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মানবিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ করতেন। এইসব জ্ঞানান্বেষী তরুণ ছাত্র বা জেরিসি বেন্থাসের বন্ধু রামমোহনের কাছে পশ্চিমী দুনিয়ার নারী সংক্রান্ত নতুন চিন্তা-ভাবনার খবর যেমন পৌঁছেছিল, তেমনি এইসব বইয়ের প্রভাবও ছিল তাদের উপর অনস্বীকার্য। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। মেয়েদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই ভাবিত হলেন। এবং এই সচেতনতার প্রথম প্রতিফলন ছিল স্ত্রীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ।[৬]

আমরা জানি যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালির জীবনধারার গতি পরিবর্তিত হয়। তবে একথাও সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

মত দুইজন মহান মনীষীর অবদান বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের ঐতিহ্যকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলেন, কিন্তু রামমোহন একে উপলব্ধি করেছিলেন অন্যভাবে। তিনি দেখেছিলেন মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতা ভেদ করে ইউরোপে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে কলা, শিল্প ও যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে যার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উপর তার শক্তি ও ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

> ইউরোপের এই নতুন মুক্তমনের চিন্তার যাঁরা জনক—বেকন, নিউটন, টম, পেইন, হিউম, বেন্থাম লক, ভলতেয়ার— তাদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। পাশ্চাত্যের এই যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অবগাহন করেই রামমোহন এদেশের যুগসঞ্চিত কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক অন্ধ অনুশাসন, জাতিভেদ, কৌলিন্যপ্রথা, নারীনির্যাতন, সতীদাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। আবার, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য তাকে যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি আবার সেই আন্দোলন স্বৈরাচারের কশাঘাতে যখন পরাজিত হয়েছে তখন সেই পরাজয়কে নিজের পরাজয়, সমগ্র মানবতার পরাজয় বলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিশ্বের সঙ্গে এই যে আত্মীয়তাবোধ–রবীন্দ্রনাথ তাকেই আধুনিকতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন বলে মনে করেছেন।[৭]

অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা নারীরা জানত সতী হলে স্বর্গলাভ হয়। বাল্যকালেই বিবাহ হয়ে যাওয়ায় সেইসব বালিকাদের বোধশক্তি সীমিত থাকার দরুন অন্যের সিদ্ধান্তেই তারা সহমৃতা হত। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবল চাপের মধ্যে আর্থিক এবং মানসিক নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না সেই সব বালিকাদের। এইসব সামাজিক কারণে পাঠান ও মোঘল শাসনকালে বহু হিন্দুনারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

> ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে। সে সময়ের সরকারি হিসেবে জানা যায়, ১৮১৫ থেকে ১৮১৮-র মধ্যে কমপক্ষে ২৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় জীবন দাহ করা হয়েছে। কলকাতা ও আশেপাশের এলাকাগুলিতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১৫২৮টি। ১৮১৫ সালের মধ্যে সতীদাহের ঘটনায় ৫১২৮ জন বালক বালিকা পিতৃহীন মাতৃহীন হয়েছিল। বাংলাদেশে সে সময় যত সতীদাহ হয়েছিল তার সাতভাগের একভাগই হয়েছিল হুগলিতে। ১৮২০-র আগে ঢাকায় (বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী) সতীদাহ হয়েছে অনেক। গরীব শ্রেণির বিধবারাই সহমরণে যেতেন বেশি। আবার সেসময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাতে সহমরণ হয়েছে সর্বাধিক।[৮]

১৮২৯ সালে সতীদাহ রোধ আইনের মধ্য দিয়েই বাংলার প্রথম নারী জাগরণের সূচনা হয়। যুগ যুগ ধরে ধর্মের দোহাই দিয়ে যে পিতৃতন্ত্র নারীকে দাবিয়ে রেখেছিল সেই বর্বরতায় আঘাত করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। পুরুষপ্রধান সমাজে এই প্রথম নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মর্যাদা পেয়েছিল সেদিন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই রামমোহনকে এ-ব্যাপারে রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী দেখতে পাই। একদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'য় সতীপ্রথা নিয়ে আলোচনা চলছে অন্যদিকে তিনি নিজে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে সতীপ্রথা নিয়ে আলোচনা করে মেয়েদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রথার অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা লিখে বিনামূল্যে তা বিতরণ করছেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে রামমোহন সতীপ্রথার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগাতে সচেষ্ট হলেন। এই প্রথা যে একই সঙ্গে অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক তা শুধু এদেশের জনগণকেই নয় বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকেও তিনি বোঝাতে চাইলেন। তাঁর এ-প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি বলাই বাহুল্য। বাঙালি সমাজে তিনি সতীপ্রথার বিরুদ্ধবাদী হিসেবে পরিচিত হলেন, অন্যদিকে লর্ড হেস্টিংসের সরকার, বিশপ হেবার প্রভৃতিরাও রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। সেই কারণে পেগসের সতী সম্পর্কিত পুস্তক এবং মিশনারি পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র পাতায় এ-যুগে রামমোহনের সতী সম্পর্কিত পুস্তিকার বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।[৯]

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা ছিল সে সময়কার বালিকা ও তরুণী বিধবাদের বাস্তব বিপন্নতার সমাধান।

বিধবা বালিকা থেকে তরুণী ও বয়সি নারীদের জীবন উনিশ শতকে কতখানি বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তা জানা যায় সরকারের কাছে পাঠানো বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন আবেদনপত্র এবং অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে। এই সকল আবেদনপত্র ও প্রতিবেদনে বলা হয় যে বিধবা নারীদের উপর পরিবারের দুর্বৃত্ত পুরুষের অনাচারের দুর্ভোগ তাদেরকে এতটাই বিপন্ন করেছিল যে, বিধবারা হয় গর্ভপাত করাতে,আত্মহত্যা করাতে না হয় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সময়ে কলকাতায় ১২,৪১৯ জন পতিতার মধ্যে হিন্দুনারী ১০,০০০ জন। ১৮৬৭ সনের হিসাবে এই সংখ্যা হয়েছিল ৩০,০০০-এর বেশি। ১৮৬৯ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে, হিন্দু পতিতা নারীর নব্বই ভাগই ছিল বিধবা।[১০]

বিধবা সমস্যার প্রধান কারণ ছিল বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কৌলিন্যপ্রথা। রক্ষণশীল সমাজশাসনে মেয়েদের অবস্থান ছিল প্রত্যাখ্যাত। সমাজের অত্যাচারী রীতি তারা বিনাবাক্যে মেনে নিতে বাধ্য ছিল, কারণ যুগ যুগ ধরে তাইতো ঘটে আসছে। এছাড়া পুরুষ এবং নারী উভয়ই সে যুগে অশিক্ষার অন্ধকারে থাকায় সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানোর চিন্তা সাধারণের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত

হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায় লিখেন—

> দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাহাদের ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন, কতশত বিধবারা ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে, বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।[১১]

বিধবানারীর কামনাবাসনা থাকা স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এ বিষয়ে সমাজের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেন বিদ্যাসাগর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ে লিখে এবং জনমত সংগ্রহ করে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনকে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ দেন। এই আন্দোলনের প্রভাব বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসমাজ। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই মানবমুখী চিন্তা সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন বিষয়। বাংলার নারীসমাজের এক অংশ সেদিন এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিল। প্রবৃত্তি নিরোধের জন্য বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে দিন কাটাতে হত। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নারী তার নৈতিক অধিকার লাভ করে।

> বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ সমাজের, দেশের, সব মানুষের (পুরুষসহ) জীবনকেই বিপন্ন করে—একথা উনিশ শতক থেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখায়, ভাষণে, কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বলেছেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আশাপূর্ণা দেবী, সুফিয়া কামাল প্রমুখ হাজার হাজার কবি, সাহিত্যিক সুধীজন, দেশ ও জাতির বরেণ্য ব্যক্তি। তাঁদের রচনাবলী পাঠে যুক্তিনির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নারীসমাজকে নিপীড়িত, নির্যাতিত করে এই প্রথাগুলো শুধু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর ক্ষতি করছে না, পুরো জনগোষ্ঠীর জীবনকেই বিপন্ন করছে। যার ফলে অন্যান্য পার্থিব প্রগতির সূচক বাড়লেও মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[১২]

নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য বিষয়। এই আন্দোলনের ফলে নারী সতীদাহ রোধ আইন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ, সহবাস সম্মতি আইন প্রভৃতি আইনি

অধিকার লাভ করে। একথাও সত্য যে আইনি অধিকার লাভ করলেও ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর সবদেশেই নারীর প্রতি অসাম্য অব্যাহত। তবুও আইনি অধিকার হল নারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার হাতিয়ার। এবং এজন্যই অনেক বাধা সত্ত্বেও নারীর আইনি অধিকারের দাবি উনিশ শতক থেকে একুশেও সক্রিয়। আজ নারী আন্দোলন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের ভিত গড়ে উঠেছিল কয়েকজন চিন্তাশীল মানুষের প্রচেষ্টায়। সমাজের সব বৈষম্য এবং কুপ্রথার অবসান ঘটাতে না পারলেও সংস্কারকদের কল্যাণকামী প্রচেষ্টা অচলায়তনে ফাটল ধরিয়ে এক নতুন দিক নির্ণয় করেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তার পূর্বে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। মেয়েদের বৌদ্ধিক গুণাবলী নেই এবং তারা লেখাপড়া শেখার অযোগ্য— সমাজে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। মেয়েরাও পুরুষের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখতে এবং চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্য উদারনীতি এবং যুক্তিবাদের আলোয় সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে পুনর্মূল্যায়নের সূত্রে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের আয়ুধ হিসেবে স্ত্রীশিক্ষাকে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে তুলে ধরা হয়।

At last the victory downeth.[১৩]

ইউরিপিডিসের মেদেয়ার এই আশার উচ্চারণ ছিল বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের ইংল্যান্ডের নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের রণধ্বনি। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের ঊষালগ্নে এই উচ্চারণই হয়ে উঠেছিল বাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি নারীর আশার বাণী।

স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়েছিল এমন সময় যখন সমগ্র বাংলাদেশ আধুনিকায়নের পথে। সতীদাহ প্রথা রোধ হয়েছে, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছে অন্যদিকে, স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয়েছে। নারীজাগরণের প্রত্যুষলগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার।

স্বর্ণকুমারীর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আত্মীয়সভার সদস্য ছিলেন। ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনায় অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে তার পরিচয় পাওয়া যায় আত্মীয়সভায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বিত রূপ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পরিবারের মধ্যে। স্বর্ণকুমারী দেবীর দিদি সৌদামিনী দেবীর কথায়,

> পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারী মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালি খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবেল পড়াইয়া যাইতেন।[১৪]

ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অভিজাত পরিবার ও জমিদার বাড়ির মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন—

> যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের

> প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূগণ, তাহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়িতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরনীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন।[১৫]

রাজা নবকৃষ্ণ এবং রাজা রাধাকান্তদেবের অন্তঃপুরেও অন্তঃপুরশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। 'হুতোমপ্যাঁচার নকশা' রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহী ও জননীর পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রাতৃজায়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আত্মকথায় লিখেছেন—

> সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন .... আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন। ... পাঠশালা সম্বন্ধে আমার যা কিছু জ্ঞান তা এই পাঠশালা থেকেই হয়েছিল; যদিও তখন আমার চার পাঁচ বছরের বেশি বয়স হবে না।[১৬]

এসব লেখা থেকে বোঝা যায় যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার এবং বিভিন্ন অভিজাত বংশের মহিলাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল। কিন্তু নারীশিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে সেসময় কোন সচেতনতা বৃহত্তর সমাজে লক্ষ করা যায় না। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা তখন চিন্তার বাইরে ছিল। মেয়েরা ছিল সমাজে সর্বাধিক অনাদৃত ও অবহেলিত। সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা ছিল সন্তান উৎপাদন। নারীর গুণাগুণ নির্ধারিত হত তার কর্মদক্ষতার উপর। মেয়েরা নিজেরাও ওই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিল এবং তাদের প্রত্যাশাও ছিল সীমাবদ্ধ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের কালে পুরুষ এবং নারীর সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে যায় এক বিরাট পরিবর্তন।

> ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাবে এদেশে সমাজ রূপান্তরের কর্মীরা পুরনো সব প্রথা, চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা ও মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন তোলা শুরু করলেন। ভেতরে বাইরে এই আলোড়ন চললো। বাংলার সমাজ রূপান্তরের রূপকারেরা বলতে শুরু করলেন 'গৃহের রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন নারীর রূপান্তর'। উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান ফল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ববৃদ্ধি। সমাজমুখীন পরিবার থেকে পরিবারমুখীন সমাজের জন্ম হলো। সমাজের কাছে এবং পরিবারের নারীর কাছে পুরুষের চাওয়ার গুণগত পার্থক্য ঘটলো। নারীর কাছে পুরুষের দাবি হলো তার সহকর্মীরূপে নারীকে তৈরি হতে হবে। মূর্খ স্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের মানসিক সম্প্রীতি ঘটবে না তাই বাংলার

> শিক্ষিত সমাজ নারীর শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়ে নারীর নবজাগরণের সূচনা করলো।[১৭]

১৮১৩ সালে চার্টার আইন ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার পর মিশনারিদের উদ্যোগেই বাঙালি মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির উদ্যোগে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি উত্তর-কলকাতার গৌরীবাড়িতে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মেয়েদের ধর্মান্তরীকরণ। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলির সুযোগ তারা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। তবে একথাও সত্য যে বাংলার সমাজে যখন মেয়েদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ এবং দোষের বলে বিবেচিত হত সে সময় নারীশিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা নারীমুক্তি আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল।

> শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের তিনজন বিখ্যাত খ্রিস্টান পাদ্রীর অন্যতম উইলিয়াম ওয়ার্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলার পশ্চাদপদ নির্যাতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের মুক্তির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ১৮২০ সালে তিনি মাতৃভূমি বিলেতে গিয়ে 'বাঙালি মেয়েদের অবস্থা' বিষয়ে বিলেতের মেয়েদের কাছে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতের 'সতীদাহ' 'বাল্যবিবাহ', 'বহুবিবাহ', 'গংগা সাগরে সন্তান বিসর্জন' এসব বর্বর প্রথার ফলে মেয়েরা কিভাবে নিগৃহীত হচ্ছে তা তিনি বর্ণনা করেন এবং বলেন যে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া এইসব দুর্ভোগ থেকে তাদের মুক্ত করা যাবে না। তাঁর আহ্বানে বিলেতের শিক্ষিত মেয়েরা ভারতবর্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের শিক্ষাবিস্তার তথা তাদের জাগরণের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে।[১৮]

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার তার দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কন্যা সৌদামিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমুদিনীকে বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠিয়ে সমাজের সামনে নজির তুলে ধরেন। মহর্ষি রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

> আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।[১৯]

স্ত্রী স্বাধীনতা এবং স্ত্রীশিক্ষায় অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

> With regard to female children there is a fourth class of men who consider female education either as practically unnecessary or as improper on social or moral grounds, who are opposed to it from a superistitious fear of the conseqences of leaving upon matrimonial happiness of their daughters. But as all these obstacles raised to the

> instruction of females are fruits only of ignorance it must be left to time and the spread of popular education to cure people of these misgivings and errors on this subject, and I have nothing to do with this class of men here.[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বাঙালির মনে আশার সঞ্চার করেছিল। অন্তঃপুরের কঠোর পর্দাপ্রথা বজায় রেখেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্তঃপুরের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'ফুলের মালা' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ 'The Fatal Garland'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> It was my loving father, Maharshi Devendranath Tagare, who had prepared me for my lifes career by giving me an education unusual for hindu girls of those days.[২১]

১৮৭৯ সালে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাসে এক নতুন দিক রচনা করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসু। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই এই দুই মহিলা ছিলেন প্রথম স্নাতক। পরবর্তীকালে চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন আর কাদম্বিনী বসু চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে যান ইংল্যান্ডে এবং এডিনবরো ও গ্লাসগো থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসেন। এভাবেই ভারতবর্ষে প্রথম উচ্চশিক্ষার পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন বাঙালি মেয়েরা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রামমোহন রায়ের কথা। মেয়েরা বুদ্ধিহীন একথা যারা বলতেন তাদের উদ্দেশে রামমোহন প্রশ্ন করেছিলেন—

> স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে, তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রী লোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?[২২]

লেখাপড়া শেখাকে সেকালে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজন হিসেবে মনে করা হত না। বেশিসংখ্যক মানুষের মনে এই ধারণাই জাগ্রত ছিল যে ভাল স্ত্রী এবং ভাল মা হওয়ার জন্যই লেখাপড়ার প্রয়োজন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তখনও গড়ে ওঠেনি। তবে ঊনবিংশ শতকের শেষে দু'দশকে চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী দাস, সরলা ঘোষাল (দেবী চৌধুরাণী) চাকুরী করে সমস্ত নারীসমাজের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

রক্ষণশীল সমাজশৃঙ্খলে বন্দি আমাদের পূর্বমাতৃকারা গ্রামাঞ্চলের নিভৃত কোণে বসে ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে লুকিয়ে অক্ষরজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন শুধুমাত্র জানার বাসনা নিয়ে। সেই রাসসুন্দরী, নিস্তারিনী দেবী সহ বহু নারীর স্বপ্ন বাস্তব হয়েছিল চন্দ্রমুখী, কাদম্বিনীদের মধ্য দিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি সমাজে প্রতীচ্যের প্রভাব পড়েছিল সমগ্র জীবনবোধে। জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা, নতুন মূল্যবোধ দৈবের পরিবর্তে মানবত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছিল নারীসত্তার বিকাশ। রাজা রামমোহন রায় যে যুগচেতনা ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয়

ঘটিয়েছিলেন এবং তাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়।

> শিক্ষার জন্যই শিক্ষা— এই মতবাদে বিশ্বাসী ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া সমর্থক। ১৮৩০-এ প্রকাশিত 'পার্থেনন'-এর প্রথম সংখ্যায়, 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়েরার'-এর পৃষ্ঠায় তারা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেছিলেন। 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা। ঈষৎ পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ, অথবা বিভিন্ন স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সক্রিয় উৎসাহ তাঁদের মনোভাবের পরিচায়ক।[২৩]

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। মেয়েরা খুঁজছিল একটু সুখের, একটু শান্তির, একটা সম্মানের জীবন। এক সময় তাদের সামনে কোনও পথ খোলা ছিল না। শুধুমাত্র অন্নবস্ত্র এবং মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য পতিতালয়কেও বেছে নিতে হত। ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হবার পর ব্রাহ্মদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অনেক নারীই বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, সেজন্য বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

> স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন ব্রাহ্মরাও। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং এরপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহায়তা পান কেশবচন্দ্র সেনের। দুজনের চেষ্টায় অনেকেই নানাবিধ কাজে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ১৮৬১খ্রিস্টাব্দে তৈরি হল সঙ্গত সভা ও ১৮৬৩-তে ব্রাহ্মবন্ধুসভা; দুটিরই পিছনে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। দ্বিতীয় সভাটির প্রধান কাজ ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষাদান। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্রই তৈরি করলেন 'ভারতসংস্কার সভা'। এ সভার পাঁচটি প্রধান বিভাগের একটি ছিল 'স্ত্রী জাতির উন্নতিবিষয়ক বিভাগ'— বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। তৈরি হল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা।
>
> ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হল ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়। মূল ও শাখা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটিতে যুক্ত হল রবিবাসরীয় নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়। প্রধানত এই সমাজের উদ্যোগেই নারীপ্রগতি সূচিত হল। এরা ভোটের অধিকার পেলেন। প্রথম স্নাতক, প্রথম চিকিৎসক ও ধাত্রীও হলেন এই সমাজ থেকে।[২৪]

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের concept টাও অল্প অল্প করে পাল্টাতে থাকে। এর পূর্বে দেখা যায় যে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে অনেক প্রগতিশীল পুরুষদেরই পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে মানসিকতার একটা দূরত্ব ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে পুরুষ শুধু সহধর্মিণী নয় সহকর্মিণী এবং সহমর্মী রূপেও স্ত্রীকে পাশে চাইল।

> দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এমন এক নতুন ধারণা দেখা দিয়েছিল, যা বাঙালির জীবনে একান্তই আকস্মিক না হলেও নতুন তো বটেই।

> এবং যেহেতু ব্রাহ্মরা একক গোষ্ঠীগতভাবে সে যুগের বাঙালি সমাজে সবচেয়ে 'আধুনিক' ছিলেন, সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে সামাজিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছিলেন এবং বিবাহ বিষয়ে নতুন মূল্যবোধের পক্ষে ছিল সবচেয়ে বেশি মুখর, অনেকেরই অবচেতন মনে ব্রাহ্মধর্ম ও নতুন চিন্তাভাবনাগত পরিবর্তন সমার্থক হয়ে গিয়েছে। সমাজ-সংস্কার, বিশেষত বিবাহ বিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণার পরিবর্তনে, ব্রাহ্ম মূল্যবোধ ও ব্রাহ্ম-পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকার ছিল সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা। বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম ভাবাদর্শের যেটা গোড়ার কথা, তা হল এই যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক। বাঙালি সমাজে এই চিন্তা সম্পূর্ণ নতুন বলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে 'অর্ধনারীশ্বর' পরিকল্পনা নিশ্চয় ছিল এবং সেই পৌরাণিক ভাবাদর্শও বাঙালি সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সর্বসাধারণের ধারণায় এই কল্পনা কেবল প্রাচীন ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিজেদের যুগে সাধারণ নর-নারীর জীবনে দেবদেবীর এই আদর্শ যে রূপায়িত হতে পারে, সে কথা অষ্টাদশ শতকে তো বটেই, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীরও বহুদিন পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারত না। কিন্তু দেবদেবীদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্ম চিন্তাবিদরা সাধারণ মানব-মানবীর জীবনেই পারস্পরিক পরিপূরকতার আদর্শ রূপায়ণের কথা ভাবতে শুরু করে মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন এনে ফেললেন। সাধারণ হিন্দুরা তার সবটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেনি, কিন্তু আগের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি সচেতন হয়ে উঠছিল। রাম ও সীতার আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে যে সব ব্যাখ্যা এই সময় থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হিন্দু সমাজের চেতনাও আরও ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্রাহ্মরাই ছিলেন পথিকৃৎ।[২৫]

নব্য আধুনিকতার আর একজন প্রতিভূ হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন চির আধুনিক পুরুষ। শুধু অবরোধ মোচন এবং সাধারণ শিক্ষা দিয়ে নয়, সত্যেন্দ্রনাথ মেয়েদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন ভেতর থেকে। তিনি চাইতেন মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। তাই তিনি স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে একা বিলেত পাঠিয়েছিলেন স্ত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। নারীমুক্তির পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। বন্ধু মনমোহন ঘোষের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি যে সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আজকের যুগে তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগলেও সেযুগে তিনি প্রগতিশীলতার নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

> এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয় স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে সৌভাগ্য

এখনও অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবন উদ্যানের পুষ্প, তাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণবীশীর্ণ করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের সম্ভাবনা।[২৬]

স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুগভীর প্রভাব রয়েছে।

পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন, পিতা তাহার অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীশিক্ষার উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী স্বাধীনতার প্রবর্তক।[২৭]

শৈশব থেকেই উন্মুক্ত উদার পরিবেশের মধ্যে দিয়েই স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হচ্ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়।

আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজি ভাল ভাল গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম— তাহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিতা।[২৮]

সেদিনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ঠাকুরপরিবারের পুরুষ এবং মহিলারা স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থন করে শিক্ষা, স্বাধীনতা, সভ্য এবং রুচিশীল এক নতুন নারীজগতের সন্ধান দিয়েছিলেন।

বঙ্গ মহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি মাত্র শাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি, আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরানিগণ একরূপ সুশোভন পেশোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙালি মেয়ের বেশের প্রতি অজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ত্রুটি করেন নাই। আমাদের বাড়িতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের মুসলমান বালক-বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্তে নিত্যনতুন পোষাকে সাজিয়াছি, পিতা মহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন।[২৯]

মনুর বিধান এবং মুসলমানী আবরুরক্ষার চিরাচরিত প্রথা ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরেও বর্তমান ছিল। কিন্তু সংস্কার আসে অন্তর থেকে। টকটকে লাল এবং গাঢ় হলুদ পেড়ে পালকির ঘেরাটোপ থেকে সেদিনকার ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা মনকে সংস্কারমুক্ত করে তাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

হিন্দুসমাজের রক্ষাকর্তারা মেয়েদের জন্য অনেক কঠোর বিধিনিয়মের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তখনকার মেয়েদের পোশাককে সংস্কৃত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মহিলাদের পোশাক বাইরে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই প্রথম মেয়েদের জন্য শালীন পোশাকের প্রবর্তন করেছিলেন। বেশবাসে আধুনিকতা ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী বিকেলে বেড়ানো এবং জন্মদিন পালন এই দুইটি জিনিষের প্রবর্তন করেছিলেন ঠাকুর পরিবারে। এছাড়া ফটোগ্রাফার দিয়ে বাড়ির মহিলাদের ফটো তুলতেন তিনি। তাঁর এই আগ্রহ এবং উৎসাহের জন্যই আজ আমরা ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি। এভাবেই জ্ঞানদানন্দিনী এগিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের।

> ঠাকুর পরিবারের মহিমা ও আভিজাত্য এভাবে বিশেষত্বে চিহ্নিত হয়ে উঠল; পরিণামে এই পরিবার পঞ্চদশ শতাব্দের ফ্লোরেন্সের মেডিসি গোষ্ঠীর মত সার্থকতা ও বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।[৩০]

১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের পেছনে ব্রাহ্ম এবং প্রগতিশীল হিন্দুদের অবদান রয়েছে। এদের অনেকের মধ্যেই স্ববিরোধিতা থাকলেও এইসব সংস্কারকামী পুরুষদের প্রচেষ্টার ফলেই আমরা পেয়েছিলাম কৈলাসবাসিনী দেবী, দ্রবময়ী, কুমুদিনী, বামাসুন্দরী, নিস্তারিনী দেবী, ব্রহ্মময়ী দেবী, অন্নদায়িনী লাহিড়ী, মনোরমা মজুমদার, জ্ঞানদানন্দিনী, রাধারানী লাহিড়ী, রাজকুমারী দেবী, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, তরু দত্ত এবং রোকেয়াদের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে নারী পরিসর সন্ধানের সূত্রপাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগে সাহিত্যে নারীর স্বরূপ তখন কেমন ছিল? ঊনবিংশ শতাব্দী হল প্রতিবাদ এবং আত্মান্বেষণের যুগ। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তখন। বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতা এবং গদ্য সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছিল এ যুগেই।

সাহিত্যের মধ্য দিয়েই যুগের ছবি ফুটে ওঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের ছবি তৎকালীন সাহিত্য থেকেই জানা গেছে। ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজজীবনে নারীর কোনও ভূমিকা ছিল না। ঋগ্বেদের প্রথম স্তরের মন্ত্রগুলিতে নারীকে অনেক স্বাধীনচারিণী রূপে দেখা গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগ থেকে গণিকা ভিন্ন আর কোনো নারীর শিক্ষার অধিকার ছিল না। তবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে পণ্ডিত কন্যা পাবার জন্য পিতামাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথা আছে। যদিও এটাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিতে হবে। ব্রাহ্মণের যুগেই নারীকে অবরোধে রাখার কথা শোনা যায়। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে আছে—

> পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রান স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।[৩১]

এর অর্থ হল নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। নারীকে শাসন ও শোষণের পুরো অধিকার শাস্ত্র দিয়েছে পুরুষকে।

> সোমযাগের একটি প্রকরণ হল অগ্নি পত্নীবৎ। সেখানে আছে ''বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে মেরে দুর্বল করা উচিত, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির পরে তার কোনো অধিকার না থাকে।'' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩) এখানে যজ্ঞের প্রসঙ্গে একটা

অনুষ্ঠানে যজ্ঞীয় হবি-কে কেন লাঠি দিয়ে মারতে হবে তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথা এসেছে; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় ওই ব্যাখ্যার ছলে স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারবার অবাধ অধিকার পুরুষকে দিচ্ছে শাস্ত্র। আর দিচ্ছে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার; এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার নিজের দেহের ওপরেও তার কোনো অধিকার যেন না থাকে সে ব্যবস্থাও পাকা করছে। প্রচলিত সামাজিক আচরণেরই শাস্ত্রীয় সমর্থন মেলে এতে।[৩২]

বৈদিক ভারতে নারীর মানুষ বলে কোনো স্বীকৃতি ছিল না। নারীকে দেখা হত অমঙ্গলের প্রতীক রূপে। নিজের দেহের উপরও তার কোনও অধিকার ছিল না। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে আছে,

তস্মাদু হ স্ত্রিয়ো ভোগমেব হারয়ন্তে[৩৩]

—অর্থাৎ নারী সম্ভোগ এনে দেয়। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে নারীকে যেভাবে ভোগ এবং কামের যন্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে তার পথ তৈরি করে দিয়েছিল বৈদিক সাহিত্যই।

নারীর অবস্থানের অবনমন রামায়ণের সীতার জীবনের মধ্যে স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সীতার সঙ্গে দীর্ঘদিন পর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন রামচন্দ্র সীতাকে বলেছিলেন যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ তিনি সীতাকে ফিরে পাবার জন্য করেননি, করেছেন নিজ বংশের কলঙ্ক মোচনের জন্য—

প্রখ্যাতস্যাত্ত্ববংশস্য নঙ্গঞ্চ পরিমার্জতা (৬/১১৫/১৬)[৩৪]

নিজের শুচিতা প্রমাণ করতে সীতাকে বারবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমাজে নারীর স্থান যে কত অসহায় ছিল এটাই তার প্রমাণ।

ওই যে পতি দেবতা, পতি নারীর একমাত্র গতি, পতির স্ত্রীকে সন্দেহ করবার অবাধ অধিকার এবং সে সন্দেহ বশে স্ত্রীকে ত্যাগ করার অধিকার, জনসাধারণের নারীর চরিত্রে সন্দেহ করবার এবং সে সন্দেহবশে নিরপরাধা নারীকে দণ্ড দেবার অধিকার এসবই এসেছে অভিপৌরাণিক যুগের সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর স্থান নিরূপণের একতরফা অধিকার থেকে। লক্ষণীয় যে লঙ্কায় সীতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলতে দেওয়া হয়নি। প্রশ্নও করা হয়নি তাঁর আচরণ সম্বন্ধে। তাঁর একমাত্র অপরাধ রাবণ হরণ করবার সময় তাঁকে স্পর্শ করেছিল। পরপুরুষের স্পর্শ এতবড় অপরাধ হয় যখন নারী একান্তভাবে অন্তঃপুরচারিনী হয়ে ওঠে। একটিমাত্র পুরুষ, স্বামী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গ তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখন। তার বিচারের পদ্ধতি হল ঙ্ম নির্দোষিত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে যে সে দোষী। অনুরূপ কোনো একনিষ্ঠতার দাবি পুরুষের কাছে নেই সমাজের। এবং নারী একনিষ্ঠতা, শুচিতা দিয়েও সমাজে সম্মানের আসন অর্জন করতে পারে না। আমরণ পরীক্ষা দেবার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।[৩৫]

তাই দেখা যায় সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীরা 'পতি পরম দেবতা' এই মন্ত্র জপ করে নারীত্বের আদর্শ প্রতিমা

হয়ে উঠেছিলেন। নারীর আত্মাবলুপ্তির জন্যই তাদের এই মান্যতা। কিন্তু তারা কেউই ব্যক্তি নারী হয়ে উঠতে পারেননি। মহাভারতের দ্রৌপদী একজন বিচক্ষণ এবং তেজস্বিনী নারী হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোধনের সঙ্গে পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির তাকে পণ রাখলে তিনি প্রতিবাদ জানাননি। কারণ স্ত্রীর একমাত্র পরিচয় সতীত্ব থেকে পতিত্বের মধ্যেই। সমাজ এবং সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে এই চিরাচরিত ধারণাই চলে আসছে।

> ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্য নারীর আদর্শায়িত প্রতিমা তৈরি করেছে একদিকে আর অন্যদিকে, তাকে সহজলভ্য ভোগ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে ঊনমানব ছাড়া অন্যকিছু ভাবেনি।[৩৬]

মহাভারতে একজন ব্যতিক্রমী নারী ছিলেন কাশীরাজের কন্যা অম্বা, যিনি সাহসের সঙ্গে নিজ বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। অম্বা বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন যে প্রথায় নারী শুধু হাড় মাংস দিয়ে তৈরি একটি পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অম্বা ব্যক্তি নারীর উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেননি। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের কাছে অম্বার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায়নি। পিতৃতন্ত্রের একনায়কতন্ত্র নারীর ভাষা, চিন্তা চেতনা এবং সত্তার অবলুপ্তি ঘটায়।

মানসিক সাহচর্য নয়, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই নারীর প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষায় এভাবেই নারীর স্থান নির্দিষ্ট হয়। কারণ সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে নারী যেন যৌন কামনা মেটানোর যন্ত্রস্বরূপ। সমাজে নারীর প্রতি ন্যায়বিচার হচ্ছে কিনা এসম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি।

> নারী-পুরুষের একান্তিক সম্পর্কের মধ্যে তাদের আশ্চর্য সখ্যের বিরলতম ছবি পাই কেবল বাণভট্টের কাদম্বরীতে, চন্দ্রপীড় ও পত্রলেখার মুক্ত সম্পর্কের বর্ণনায়। নইলে সংস্কৃত সাহিত্য জুড়ে শুধু যৌন আগ্রাসনের ছবি। অলংকার শাস্ত্রের ফতোয়া অনুযায়ী ছকে-বাঁধা নারী প্রতিমার মিছিল দেখতে পাই আমরা। আকণ্ঠ এবং অকুণ্ঠ ভোগের বাইরে নারী-পুরুষের সম্পর্কে অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই যেন। বাৎসায়নের কামসূত্র এবং অমরুশতক এই ধারার দুটি স্তম্ভ। কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, দশকুমার চরিত, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, শৃঙ্গারশতক, রাজতরঙ্গিনীঙ্ক নানা প্রশাখার এইসব পাঠকৃতিতে কেবল থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া বড়ি-থোড়। প্রেমিকা শব্দের আড়ালে ভোগ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে নারী। নায়িকা ও গণিকার মধ্যে ব্যবধান কার্যত লুপ্ত। আসলে, বাৎসায়নের সাক্ষ্য অনুযায়ী, মনের চাহিদা মেটানোর কোনো উপায় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ছিল না। যাদের নিরুচ্চার অন্ধকারে বাতায়নহীন রুদ্ধতায়, অশিক্ষার স্তব্ধতায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত করা হয়েছে— ধীমান পুরুষ শরীরের ক্ষুধা মেটানোর পরে তাদের প্রতি আর আকর্ষণবোধ করত না। চৌষট্টিকলায় নিপুণ বারাঙ্গনারা যেমন কামতৃপ্তিতে বৈচিত্র্যের স্বাদ দিতে পারত, তেমনি বৌদ্ধিক বিনিময়েও তারা অপটু ছিল না। পরবর্তী সাহিত্যে নারীর ছবি আঁকতে গিয়ে কবিরা নিশ্চয় অন্ধকার গৃহকোণে তাকাননি, নির্দিষ্ট আকল্পভুক্ত বর্গনারীদের অবচেতনাভাবে

নিয়ে এসেছেন উদ্ভাসিত গণিকালয় থেকে। এটা নিশ্চয় কাকতালীয় নয় যে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে গণিকা বসন্তসেনা প্রথমত গভীর সংবেদনায় ঋদ্ধ প্রেমিকায় এবং পরে প্রেমিকা থেকে গৃহিণীর পদবিতে উত্তীর্ণ হয়। তবে বসন্তসেনা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম, অপূর্ণতা সত্ত্বেও ভবভূতির কিছু কিছু উচ্চারণ তেমনি ব্যতিক্রমমাত্র। লক্ষণীয়ভাবে, মালতীমাধবে মালতীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের ঝিলিক দেখা যায় এবং উত্তররামচরিতে সীতা সবচেয়ে সহজ ও নিরলঙ্কার ভাষায় প্রেমের সবচেয়ে গভীর উচ্চারণটি করেনঙ্ক 'অসমেতস্য হৃদয়, জানামি, মমাপেষঙ্ক কিংবা 'তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়জন ঙ্ক।' কিন্তু ভবভূতি নন,কল্হন বা মাঘ বা ভারবিই পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে ভারতীয় বাস্তবতার প্রতি বেশি বিশ্বস্ত।[৩৭]

পুরুষের আধিপত্যবাদী কৃৎকৌশলের জগতে নারী সর্বদা প্রত্যাক্ষাত অপর। সর্বংসহা আত্মসমর্পণে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। অথচ,

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরি[৩৮]

এই কথাটি একদিন নারীর প্রতিবাদী উচ্চারণ হয়ে উঠতে পারত। এ সম্পর্কে ড. তপোধীর ভট্টাচার্য একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন—

নিম্নবর্গীয় অন্তেবাসী মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের প্রতিবেদন সন্ধাভাষার আড়াল ভেদ করে চর্যাপদে ব্যক্ত হয়েছিল বলে অন্য অনেক কিছুর মধ্যে নারীর বর্গ এবং লিঙ্গগত বাস্তবতাও প্রতিফলিত হয়েছিল। বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল এই আশ্চর্য কালোত্তর উচ্চারণ 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরি'। নারীর নিজস্ব পাঠকৃতি-সন্ধান এই বিন্দু থেকে শুরু হতে পারত। হল না যে, তার কারণ হিসেবে আমরা ইতিহাসের অন্তর্ঘাতকে দায়ী করতে পারি। নিম্নবর্গীয়দের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক ইতিহাসের যে-সন্ধিক্ষণে জেগে উঠেছিল, প্রতাপের নিয়ন্তাদের চরিত্র-বদল হওয়ার পরে তা হারিয়ে গেল। ইসলামীকরণের পরে আন্তেবাসীদের পাঠপরম্পরায় ছেদ পড়ল। প্রান্তিকায়িত নারীসমাজের প্রেক্ষণ-জাত লোক সাহিত্য যখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কৃৎকৌশলে রূপান্তরিত হলো অর্থাৎ পরিবর্তিত বাস্তবের দাবিতে আধিপত্যবাদী বর্গ যখন নারী-পুরোহিতদের তৈরি ব্রতকথা, লোককথা, লোকপুরান ইত্যাদিকে 'পরিশুদ্ধ' করে মঙ্গলকাব্য ধারার গোড়াপত্তন করছিল— ফুল্লরা, লহনা, বেহুলা রঞ্জাবতীর মতো নতুন নারীদের আমরা পেলাম কিন্তু তাদের পাঠও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা সংশোধিত, এইজন্য নারীর উচ্চারণে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তারা শেষপর্যন্ত উপগ্রহের মতো গ্রহের নিয়ন্তা অভিকর্ষ মেনে নিয়েছে।[৩৯]

রামচন্দ্র যে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন সমাজমানসে তার ফল নারী আজও বহন করে চলেছে। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে দেখি মৃত স্বামী লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য বেহুলার স্বর্গযাত্রা এবং অনেক কষ্ট

সহ্য করে স্বামীকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনা। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনিও তাই। পিতৃতন্ত্র এই উদাহরণগুলি নারীর আদর্শ রূপে তুলে ধরেছিল শুধুমাত্র নারীকে অবদমিত করে রাখার জন্য।

উনিশ শতকে বাংলায় যে সমাজবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল সেখানে নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারতার মধ্য দিয়ে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন রয়েছে।

> বাস্তবে তখন নারীমুক্তি সম্ভব হয়নি, কিন্তু কাব্যে তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপনের পূর্বে কোনও নারী সঙ্ঘ এদেশে ছিল না। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে মাঘোৎসব ব্রাহ্মিকা সমাজে মহিলা উপস্থিত থাকবার সুযোগ দেওয়া হল। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনাপর্ব। মেয়েরা এই প্রথম পুরুষের পাশে বসবার অধিকার পেল। ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে ১৮৫৮-এ-এর ইচ্ছামাত্র সূচিত হয়েছিল, ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রথম ইচ্ছাপূরণ। মেঘনাদবধ যখন লেখা হয় তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার উন্নতি আরম্ভ হয়েছে, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ডিরোজিওর প্রভাবে সুশিক্ষিত বাঙালি যুবকরা হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করেছিলেন, গৃহে তা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্র তখনও প্রস্তুত হয়নি। কাজেই অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা সঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখে কৃতবিদ্য যুবক সেদিন মোহিত হয়েছিলেন। দেশি বিদেশি আদর্শের এমন নিপুণ মিশ্রণ সেকালের কবিকল্পনায় আর কোথাও নেই, মনে হয় কবিমানসের আদর্শ নারী কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। প্রমীলা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক নায়িকা কুলের অগ্রজা। বেহুলার সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে তিলোত্তমার নারীমর্যাদাটুকু সম্মিলিত হয়েছে প্রমীলা চরিত্রে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বিভিন্ন ভদ্রমহিলা যে দাবি তুললেন তা শুধু বাঁচার দাবি নয়, নারীত্বের দাবি, সমান অধিকারের দাবি।[৪০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে নারীর অবস্থান এবং সত্তা সম্পর্কে লেখকেরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন সেজন্য সে সময়কার পত্রপত্রিকা, কবিতা, নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে নারী বিষয়ক সমস্যাগুলি উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্ব কতটুকু ফুটে উঠেছে? এর উত্তরে এটুকু বলা যায় যে নারীকে পিতৃতান্ত্রিক নিগড় থেকে বের করে তাকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে জনমনকে সচেতন করে তোলা হচ্ছিল। এইসব সমস্যার বিপক্ষে রক্ষণশীলদের লেখা থেকেও বুঝতে পারা যায় যে এই সচেতনতা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে আঘাত করেছিল। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের অনুসন্ধান পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় একটি

লেখা থেকে রক্ষণশীলদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

> পাশ্চাত্য সভ্যতার অমোঘ অস্ত্র দুইটি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই দুই অমোঘ অস্ত্র যে সমাজের উপর ক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিতে হইবে। অগ্নিদাহের সময় যেমন সমস্ত দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই স্তূপাকার ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সেইরূপ স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা যে সমাজে প্রবেশ করিবে তাহাকে সহসা বিলাস বিশ্রামাদির বাহ্যিক চাকচিক্যে উজ্জ্বল করিবে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সার পদার্থ ধর্ম ও নীতি প্রভৃতি ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজের পুরুষজাতি যেরূপ ধর্মভ্রষ্ট বিলাসী স্বার্থপর ও স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী হইয়া উঠিতেছেন, রমণীগণ যে অনুরূপ হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কী?[৪১]

যে সমাজে নারী শুধু মেয়েলোক বলেই পরিচিত ছিল, শুধু সন্তান উৎপাদন এবং পতির আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়াকেই যে আদর্শ বলে জানত সেই নারী উনিশ শতকে গুরুত্ব পেল। মিশেল ফুকো বলেছেন বারবার একটা মিথ্যা উচ্চারিত হলে তা সত্যে পরিণত হয়। মৈত্রায়ণী সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হয়েছে যে নারী অশুভ। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে কালো পাখি, শকুনি, নেউল ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী এবং শূদ্রকে হত্যা করলেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত। হাদিসেও সেই একই কথা বলা হয়েছে যে নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। সাধারণ মানুষের কাছে শাস্ত্রই ছিল তখন সবকিছুর ঊর্দ্ধে। নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে শাস্ত্রকে যাচাই করে নেবার চেতনা তাদের ছিল না। উনিশ শতকের নব্যভাবনা মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল যার ফলে নারীর প্রথম অর্গলমুক্তি ঘটল একথা মানতে হবে।

তবে আরও পথ বাকি ছিল। সংস্কারপন্থীদের মধ্যেও নারীমুক্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় মেয়েদের লেখনীর সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মেয়েরা কী লিখবে এবং কী বিষয় নিয়ে লিখলে সমাজে তা গ্রহণীয় হবে এ সম্পর্কে কিছু অলিখিত শর্ত আরোপিত ছিল। অর্থাৎ মেয়েদের লেখা হতে হবে কোমলকর নির্গত, যৌনতাবর্জিত। কারণ সভ্যতা ও শালীনতা সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে গঠিত। মেয়েদের উপর লিঙ্গ রাজনীতির চাপ এত প্রবল ছিল যে কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখার প্রতিবাদী সুর শোনা গেলেও পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় আর সেই সুর শোনা যায়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনীর লেখার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। মেয়েরা যে লিখতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তো বলেছিলেনই যে মেয়েদের ধারণশক্তি থাকলেও সৃজন শক্তি নেই। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় বামাসুন্দরীর লেখা 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' নামক গদ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে পত্রিকার সম্পাদককে প্রমাণপত্র লিখে দিতে হয়েছিল পাঠককুলের সন্দেহ দূর করার জন্য যে রচনাটি একজন মহিলারই লেখা। মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বঙ্গমহিলা' (১২৭৭) প্রকাশিত হবার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছিল—

> এই আশা করি যে কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী-জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ

পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।[৪২]

মেয়েরা পত্রিকার সম্পাদিকা হলেও তাদের মেনে চলতে হত পুরুষ নির্দেশ।

কিন্তু মনের সীমানাকে তো আর বেঁধে রাখা যায় না। শিক্ষার স্বাদ পাবার পর ধীরে ধীরে মেয়েরা নিজেদের পথ নিজেরাই তৈরি করে নিতে লাগলেন আর সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছেন এ যুগের লেখিকারা।

আবার ফিরে আসি রাসসুন্দরী দেবীর কথায়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম রাসসুন্দরীর। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তখনও অস্তাচলে। কিন্তু বাংলা অজ পাড়াগাঁয়ে বসে সেই আলোর আভাস অনুভব করেছিলেন রাসসুন্দরী। সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা তিনি তুলে ধরেছেন 'আমার জীবন'-এ লেখা পড়া শেখার জন্য রাসসুন্দরীর এই আন্তরিক ব্যাকুলতার মধ্যে একটি নতুন যুগের প্রতিফলন ধরা পড়ে।

হে পরমেশ্বর। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়ব।[৪৩]

রাসসুন্দরী দেবীর এই আর্তি থেকে বোঝা যায় যে মেয়েরা তখন সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে থেকেও লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। রাসসুন্দরীর এই প্রার্থনা বিফল হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকজন মহিলা লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা যে কী বিপুল পরিমাণে বুঝতে পেরেছিলেন, তা ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক লেখা পত্রে। সমগ্র বাঙালি সমাজের তুলনায় তারা হয়ত সংখ্যায় অত্যল্প। কিন্তু এ বিষয়ে খুব অকৃত্রিম ছিল তাঁদের বিশ্বাস। কৈলাসবাসিনী দেবী স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের সমস্ত গুজব আপত্তি খণ্ডন করে মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিলেন। হেমলতা দেবী সৎপুস্তক পাঠ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে 'অমূল্য' বলেছিলেন। এই ধরনের পুস্তকপাঠে 'হৃদয়ের পবিত্র ও উচ্চ ভাব সকল উত্তেজিত হয় ও প্রস্ফূটিত হয়।' আর পরবর্তীকালে লীলাবতী মিত্র স্ত্রীশিক্ষাকে বাংলাদেশের উন্নতির অন্যতম শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে উচ্চশিক্ষার অভাবেই মেয়েদের মধ্যে হৃদয়ের ঔদার্য ও মহত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই রচনাগুলি পড়লে বোঝা যায়, গোটা সমাজের পক্ষে খুব নগণ্য হলেও কয়েকজন মহিলার নিজস্ব জগতে শিক্ষা কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। মেয়েদের পূর্বাপর অপরিবর্তিত জগতে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ছিল গত শতকের মেয়েদের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কত মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বা কত মেয়ে বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন, যা পরোক্ষে তাদের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতার প্রতিফলনের প্রমাণ দেয়।[৪৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা তাদের কবিতায় নারীকে গৃহজীবনের কর্মব্যস্ততার বাইরে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেও ব্যক্তিনারী সেখানে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণ যে— মানবকেন্দ্রিকতার সূচনা করেছিল, তাতে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু নারীর অবস্থান রাতারাতি পালটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। বরং উপন্যাসে, মহাকাব্যে নারীপ্রতিমা নির্মাণ অবারিত হয়ে উঠেছিল কেননা সমসাময়িক

জীবনের গ্লানিকর বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্য মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ সামূহিক অবচেতনে সক্রিয় ছিল। এছাড়া পুনর্জাগরণের শর্ত অনুযায়ী ধ্রুপদী সাহিত্য-ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা ছিল বলে আদর্শায়িত নারীর আদিকল্পগুলি ব্যবহার করা কবিদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।[৪৫]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রেনেসাঁসের জীবন ভাবনায় নারীসত্তার নতুন আকল্প গড়ে তুলেছিলেন। প্রান্তিক নৈঃশব্দ্য থেকে উপেক্ষিতা নারীর উচ্চারণ উঠে এসেছিল চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে—

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজালে আপনি![৪৬]

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' একজন অন্তেবাসী নারীর পক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উচ্চারিতও হয়েছিল এই উক্তির মধ্যে দিয়ে।

পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনে বহু শতাব্দী ধরে নৈঃশব্দ্যে— নির্বাসিত লাঞ্ছিত নারী শাস্ত্রবাক্য ও দেশাচারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মানবিক অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত ঊনমানব হিসেবে ব্যক্তি হয়ে ওঠার কোনো উপায়ই জানা ছিল না তার। মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার ক্ষণিক উপস্থিতিকেও নারী পরিসর ঘোষণার সুযোগ হিসেবে সদ্ব্যবহার করেছেন। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুরুষসর্বস্ব পৃথিবীর একদেশদর্শিতার দিকেই যেন অভিযোগের তর্জনি তুলে ধরেছেন উনিশ শতকের মূল্যবোধসম্পন্ন চিত্রাঙ্গদা। রাবণের নিজস্ব জগতে দাঁড়িয়ে কেউ তাকে অভিযুক্ত করতে পারে আত্মবিনাশ ও আত্মপ্রতারণার দায়ে তা অভাবনীয়। এ কাজ যে করতে পারলেন চিত্রাঙ্গদা, এই তো তাঁর প্রতিবাদ— তাঁর বিদ্রোহ। কেননা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস শুধু দেখাননি তিনি, অতি উদ্ভাসিত রাবণের মধ্যেও থাকতে পারে অমেয় অন্ধবিন্দু— এই সংকেত দিয়েছেন। অপরতার এই অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিক দর্পণ এভাবে পাঠকৃতির গভীর অবতল থেকেই উঠে এসেছে।[৪৭]

পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বলয় থেকে মধুসূদনের প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদারা নির্দিষ্ট কোনো পরিসরে পৌঁছতে না পারলেও মধুসূদন তাদের মধ্যে এক প্রতিবাদী মন সৃজন করেছিলেন যা পুরুষ শাসিত সমাজের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) কবিতায় এমন একজন নারীকে দেখা গেল যে পুরুষের পাশে সম অধিকারের দাবি করল।

নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে
সে নহি নহি,

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।[৪৮]

এখানে দেখা যায় যে দূরীকৃত অপর হিসেবে ঊনমানবের অবস্থানকে নারী স্বীকার করতে চাইছে না। পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে নারীর নিজস্ব পরিসরে পৌঁছনোর প্রাথমিক সঙ্কেত পাওয়া যায় চিত্রাঙ্গদার এই উক্তির মধ্যে।

উনিশ শতকের কাব্যে মেয়েদের লেখা কবিতায় নারীচেতনার স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে বেশিরভাগ কবিতা নারীর ব্যক্তিগত জীবনের বিষাদ এবং অতৃপ্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে। তাদের অনুভূতি সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

> রচনানৈপুণ্য সত্ত্বেও তারা কিন্তু ভাবে ও ভাষায় নারীচেতনার কোনো ইঙ্গিত দেননি, অভ্যুদয়ের পর্বে নারীসত্তার স্বতন্ত্র তাৎপর্য তাঁদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার কথাও ছিল না। তাই নারীর নিজস্ব প্রতিবেদনে তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি। যতটুকু চোখে পড়েছিল, ততটুকু মাত্র লিখেছেন; গভীরতর কোনো অবতলের আভাস ওই লেখিকারা দিতে পারেন নি।[৪৯]

মেয়েদের লেখা কবিতাকে সমাজে সহজভাবে দেখা হত, কারণ, সমাজের চোখে মেয়েদের লিঙ্গবৈশিষ্ট্য হলো তাদের আবেগপ্রবণতা। অল্পবুদ্ধি মেয়েরা যে গদ্য লিখতে পারবে এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল সমাজে। কারণ মেয়েরাও যে পুরুষদের মতোই তাদের চিন্তার প্রকাশ করতে পারে তা তখনকার সমাজে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন মেয়েদের সৃজন শক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের এই মতের প্রতিবাদ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'রমাবাই' প্রবন্ধে।

> ইউরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ আর কতদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী—নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন? কাব্য উপন্যাসের বিশেষ প্রভেদ প্রধানত একের ভাষা গদ্যময়— অন্যের ভাষা ছন্দোময়। কবিত্বকল্পনা ও মনুষ্যচরিত্রজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সৃজনশক্তির রূপভেদ থাকিলেও ক্ষমতার বিকাশে কেহ হীন নহে। ইহা তো গেল একটা সাধারণ কথা— কিন্তু কাব্যেও যে রমণী তাঁহার সৃজনবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, তাহাও নহে। মিসেস হেমান্স, মিসেস ব্রাউনিং কোনো অংশেই বার্নস অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি নহেন, তবে রমনীদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কোনো সেক্সপিয়র জন্মগ্রহণ

করেন নাই, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তেমনি উপন্যাসরাজ্যে কোনো পুরুষ জর্জ এলিয়টকে এখনও অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই।[৫০]

১৮৮৫ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' নামক গ্রন্থে দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার বিষয়ে সচেতন চিন্তাভাবনার প্রকাশ হয়েছে। নারীর লেখায় জাতির ভাবনার প্রকাশকে ঔপনিবেশিক শাসক সহজ চোখে দেখেনি। তাই প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

লিঙ্গরাজনীতির চাপ মেয়েদের উপর এত প্রবল ছিল যে কৃষ্ণভাবিনীর মত বলিষ্ঠ মনের লেখিকাকেও থেমে যেতে হয়েছিল। 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধটিতে কৃষ্ণভাবিনী নারী ও পুরুষের সমঅধিকারের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু তার এই উত্থাপনই পুরুষ সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আসলে মেয়েরা লেখার জগতে প্রবেশ করবার পর থেকেই পুরুষেরা নিজেদের নিরাপদ বোধ করছিলেন না। ম্যাগি হুম বলেছেন—

> A male reading as a feminist, is not a feminist critic because he carries with him the possibility of escape into masculinity and into patriarchy.[৫১]

বাখতিনের মহাসূত্র মতে অস্তিত্ব হল পরস্পরের সত্তার অংশীদার হওয়া। সেজন্য পুরুষকে নারীর সহযোগী সত্তা হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে পুরুষরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। নারীকে ঘরের বাইরে এনে বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রগতিশীল পুরুষরাই। কিন্তু সুক্ষ্মভাবে দেখলে এই সব পুরুষরা যে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে একেবারে উদারপন্থী ছিলেন তা নয়। অশিক্ষিতা স্ত্রীর কাছে মানসিক নির্ভরতা পাওয়া যায় না এই বোধ থেকেই তারা মেয়েদের অল্প শিক্ষা অল্প স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েরাও পুরুষ নির্ধারিত পথেই চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। সেসময় প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ছিল তার দলিলস্বরূপ।

> নারী সেদিন ভাবত পুরুষ যা ভাবত তাই-ই। নারী-রচনা বিশেষ করে নামী লেখিকাদের, যেমন মানকুমারী বসু (জ.১৮৬০)-র রচনা পুরুষ-উক্তির প্রতিধ্বনি ঃ শিক্ষিত হও সংসারের কল্যাণসাধনের জন্য, সুপুত্র পালনের জন্য, স্বাস্থ্য সম্পদ পরিবার সমৃদ্ধ করার জন্য। নারীর নিজ বিকাশের জন্য যে শিক্ষার বা পারিবারিক সহযোগিতার প্রয়োজন, এ যুক্তি বামাবোধিনীতে পুরুষ বা সিংহভাগ নারী প্রয়োগ করেননি। তবে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সজোর ওকালতি ছিল। সেটা কম পাওনা নয়।[৫২]

কিন্তু সর্বত্র ছবি একরকম ছিল না। বামাবোধিনী পত্রিকার বামা রচনা অংশে মহিলাদের লেখায় নারীচেতনার উদ্ভাস লক্ষ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়।

> ...খিদিরপুর থেকে এক অনামিকা বক্তব্য রেখেছিলেন, 'স্ত্রীশিক্ষার সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না' (১৮৮৪)। বরিশাল থেকে নিজ নামে কামিনী গুপ্ত (সাহসিনী!) স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন ১৮৮১-তে (কাদম্বিনী

গঙ্গোপাধ্যায়-চন্দ্রমুখী বসুর স্নাতক যে সালে), প্রমাণিত হয়েছে শিক্ষালাভে স্ত্রী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন, 'সুতরাং তাহাদিগের সুখ ও সৌভাগ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই।' বিশ শতকে পৌঁছে জনৈকা বলেছেন 'পুরুষের জীবনে যেমন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, নারীদের জীবনেও সেই রূপ মহৎ বা তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দশ্যে আছে।[৫৩]

এভাবেই মেয়েরা ধীরে ধীরে সম্পাদনার কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন। তবে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাকেও পুরুষ নির্দেশ মেনে চলতে হত। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র 'বঙ্গমহিলা'র (১২৭৭) সম্পর্কে তত্ত্ববোধনী মতামত প্রকাশ করেছিল—

> এই আশা করি যে কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রী-জনোচিত শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়াও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরনীয় হইবে।[৫৪]

এই কথাকে মনে রেখে পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে গড়া পথেই 'বঙ্গমহিলা' অগ্রসর হয়েছিল—

> বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যেসব যুক্তি-প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না।[৫৫]

উনিশ শতকে মেয়েদের পদার্পণ অনেকটাই দ্বিধান্বিত মনে হয় যেন সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতাকে নারী সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে গুরুত্ব পেয়েছিল যদিও, বেশিরভাগ পত্রিকাই অন্তঃপুর শিক্ষারই পক্ষে ছিল। ১২৭৭ সালে প্রকাশিত বঙ্গমহিলা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

> শিক্ষাভাব এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু অধুনা বঙ্গললনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ... উচ্চতর শিক্ষালাভ হউক তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথাও নাই।[৫৬]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্ত্রীর কাছে মানসিক নির্ভরতা পাওয়ার জন্যই পুরুষরা নারীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। লিঙ্গ রাজনীতির কৌশল এত জটিল ছিল যে মেয়েরা কী জাতীয় বিষয় নিয়ে লিখবেন সেটাও তারা নির্ধারণ করতেন। তাই মহিলা পত্রিকার সম্পাদকেরও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিচার বিবেচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক পরিধিকে অতিক্রম করে প্রতিবাদী সত্তা হিসেবে চিহ্নিত হতে তারা চাননি।

> বাংলায় উন্নত জাতের, ভিক্টোরীয়, নারীর-স্বপ্ন দেখে প্রথম ইংরেজ ধর্ম প্রচারকেরা প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করে তারাই। বাঙালির প্রথম প্রয়াস ছিলো ওই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেওয়া, স্বপ্ন বারবার ভেঙে দেওয়া। ওই ইংরেজ ধর্ম ও শিক্ষাপ্রচারকেরাও প্রগতিশীল গোত্রের ছিল না, তারা বিশ্বাস করতো না নারীমুক্তিতে;

> তারা বিশ্বাস করতো কিঞ্চিৎ শিক্ষায়। নারীশিক্ষার সঙ্গে এদেশে বিদেশী ও দেশী যারা প্রথম জড়িত ছিলো, তারা ছিলো ভিক্টোরীয়; ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত কুসংস্কারে তারা ছিলো আচ্ছন্ন, যদিও ভিক্টোরীয় কুসংস্কারকেই তারা মনে করতো সভ্যতা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় যখন নারীশিক্ষা একটু ব্যাপকভাবে শুরু হয়, তখন নারীপুরুষ সম্পর্কে ভিক্টোরীয় জনপ্রিয় ধারণা ছিলো যে নারী পুরুষ পৃথক ও পরিপূরক; নারীর স্থান গৃহ। পুরুষের স্থান বাইর। টেনিসনের প্রিন্সেস (১৮৪৭), রাসকিনের সিসেম অ্যান্ড লিলিজ-এ (১৮৬৫) প্রস্তাবিত হয় যে-পৃথক এলাকাতত্ত্ব বা পরিপূরকতত্ত্ব, তাই গ্রহণ করেছিলো তারা, মিলের দি সাবজেকশন অফ উইমেন এ (১৮৬৯) নারীর যে-অধিকার দাবি করা হয়, তা ছিলো তাদের কাছে ভীতিকর। টেনিসন, রাসকিন ও ভিক্টোরীয়রা চেয়েছিলেন নারী কিছুটা অগভীর ব্যবহারিক জ্ঞানও আয়ত্ত করবে, কিন্তু তার জ্ঞান কাজে খাটাতে পারবে না, সে হবে স্বামীর সুখকর সেবিকা ও বিনোদসঙ্গিনী। নারী হবে পুরুষের বাইবেলি 'হেল্পমিট' বা দাসী। উনিশ শতকের নারীদের জন্যে ও নারীদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম বেশ তাৎপর্যপূর্ণ জ্ব বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩), অবলাবান্ধব (১৮৬৯), বঙ্গমহিলা (১৮৭৫), ভারতী (১৮৭৭), পরিচারিকা (১৮৭৮), পাক-প্রণালী (১৮৮৩), গার্হস্থ (১৮৮৪), মহিলা-বান্ধব (১৮৮৭), দাসী (১৮৯৭), মহিলা (১৮৯৭), অন্তঃপুর (১৮৯৮)। পরিচারিকা, আর দাসীধর্মী নামই জানিয়ে দিয়েছে নারী আসলে কী?[৫৭]

অন্ধকারে থাকা নারী সেদিন যেটুকু শিক্ষার স্বাধীনতা পেয়ে ছিলেন তাই তাঁর কাছে ছিল অনেক পাওয়া। এবং সেজন্যই—

> স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও এ সময়ের অনেক পত্রিকাই মনে করত মেয়েদের তেমন শিক্ষাই দেওয়া দরকার যাতে তাঁরা সুগৃহিণী হতে পারেন, যত্ন করে সন্তান পালন করতে পারেন, সন্তানকে অ, আ, ক-খ পড়াতে লেখাতে পারেন, বাজার খরচের হিসেব নিকেস রাখতে পারেন, বড়জোর স্বামী দূরে থাকলে তাকে চিঠিপত্র লিখতে পারেন। সতীত্ব পতিসেবা দয়া ও ত্যাগই যে মেয়েদের একমাত্র আদর্শ বারবার শোনা যেত এ সব পত্রিকার পাতায়। পুরুষদের মতো স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ বা ডিগ্রি লাভে তীব্র আপত্তি ছিল এদের।[৫৮]

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে মেয়েদের ডিগ্রিলাভ সম্পর্কে পরিচারিকা পত্রিকার ১২৯৭ সালের মাঘ সংখ্যায় লেখা হয়—

> যদ্দারা স্ত্রীরা বিধাতাপ্রদত্ত নিজ অধিকার ছাড়িয়া পুরুষের রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হন... তাহা কি কখন জনসমাজকে সুখশান্তি বিধান করিতে পারিবে?[৫৯]

এ ভাষা নারীর নয়, পুরুষের অধিকৃত জগতে বাসকারী প্রত্যাখ্যাত অপরের চেতনাও এখানে অধিকৃত।

উনিশ শতকে মহিলাদের রচনা সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও অকাল বৈধব্য-সমস্যা এবং বিধবা বিবাহ। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথমেও বিষয়টি মহিলা সম্পাদিত পত্রিকায় গুরুত্ব পায়নি। এ বিষয়ে একটা দ্বিধা কাজ করছিল। অন্তঃপুর পত্রিকার মাঘ ১৩১১ সালে বসন্তকুমারী বসু লিখেছিলেন—

> যদিও বিবাহ, বিধবা জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে বলপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্রতী করাতেও কোনও ফলোদয় হয় না।[৬০]

আবার ওই পত্রিকারই ১৩১১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় নগেন্দ্রলাল সরস্বতী বিধবা বিবাহকে

> সমাজের পক্ষে পরম প্রেয়স্কর[৬১]

বলে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এভাবেই দিন যত এগিয়ে গেছে সামাজিক ঘাত প্রতিঘাত তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মেয়েরা অগ্রসর হয়েছে অন্তহীন আগামীর পথে।

> পুরুষতন্ত্রের অভিযোগ তারা উৎকৃষ্ট মাতা ও গৃহিনী নয়; তারা আশা করেছিলো নারী শিক্ষিত হয়ে ঘরে ঘরে নেপোলিয়ন, জর্জ ওয়াশিংটন প্রসব করবে; পুত্রদের ক'রে তুলবে মহাপুরুষ, স্বামীদের করবে শিক্ষিত সেবা। কিন্তু দেখতে পায় স্বর্গে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। হাওয়া গন্ধম খেতে শুরু করেছে আদমের অনুমতি ছাড়াই।[৬২]

তারপরে এল উপন্যাসের কাল। নারীর লেখনীকে থামিয়ে দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মেয়েরা প্রবেশ করলেন কথা সাহিত্যের জগতে। শুরু হল আত্মানুসন্ধানের সংগ্রাম।

> মেয়েরা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিল নিজেদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে, নিজেদের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সত্তা বিষয়েও। তাদের আত্মপ্রকাশের আগ্রহ এই কালপর্বে এত তীব্র হয়ে উঠছিল বোধহয় এইজন্যই যে, শিক্ষার বিভাগ আলোকিত এই আত্মবিশ্বাসী মেয়েরা সমাজের চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন— কোথাও তাদের জন্য কোনো সম্মানের আসন অপেক্ষা করে নেই, প্রস্তুত হয়ে নেই কোনো শ্রদ্ধার পটভূমি, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে বা সমাজ সুরক্ষণে তাঁরা শুধু প্রয়োজনীয় 'বিষয়' মাত্র। সমাজ নির্দিষ্ট এই ভূমিকাকে পার হয়ে আসার দায় যাঁরা সেদিন মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তারাই প্রথম যুগের নারী-ঔপন্যাসিক; আত্মপ্রকাশের আগ্রহে, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে, কিংবা আত্মপরিচয় অন্বেষণের ইচ্ছায় লুকিয়েছিল তাদের হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার বীজ।[৬৩]

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এই পরিণত নারীমন নিয়েই এসেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ (১৮৭৬) প্রকাশিত হবার পর বৌদ্ধিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গ্রন্থটিতে লেখিকার কোনো নাম ছিল না। সুদূর বিলেতে বসে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটি পড়ে ভেবেছিলেন অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। স্বর্ণকুমারীর বড়ো মেয়ে হিরন্ময়ী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়—

মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?[৬৪]

সাধারণী পত্রিকা লিখেছিল —

দীপনির্বাণ নামে একখানি অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।[৬৫]

কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির পর মেয়েরা যে উপন্যাস লেখার মতো দুঃসাহসিক কাজ করে বসবে এতটা আশা পুরুষরা করেননি। কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষটি (রবীন্দ্রনাথ) তো বলেই দিয়েছিলেন যে মেয়েদের সৃজনী শক্তি নেই। রাণী চন্দকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

হাজার হোক এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের build সব দিক থেকেই আলাদা। পুরুষের brain, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম, তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম? সংসারের বাধা বিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হোলেও, মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারে না।[৬৬]

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না রবীন্দ্রনাথ। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

She is one of those unfortunate beings who has more ambition than abilities. But Just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been taken advantage of by some unscrupulous literery agents in London and she has had stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been succesful in making her see things in their proper light.[৬৭]

স্বর্ণকুমারী দেবীর বেশিরভাগ উপন্যাসই লেখা হয়েছিল বঙ্কিমযুগে। দুর্গেশনন্দিনী রচনার এগার বছর পরই দীপ-নির্ব্বাণ প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'কাহাকে?'ও রচিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সময়। এখন দেখা যাক মহিলারচিত উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কী ধারণা পোষণ করতেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ (১৮৭৫) 'মনুষ্য ফল' নামক প্রবন্ধে কমলাকান্ত বলেছেন—

তারপরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা —কখন আধখানা বই পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি

> সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অস্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই। কিন্তু দুই মালার মাপে।[৬৮]

নারী ঔপন্যাসিক সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিকে তীব্র পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায় নারীলেখিকা সম্পর্কে একটা ভীতি কাজ করছিল তখন পুরুষের মনে। সেজন্যই থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল কৃষ্ণভাবিনী দাসকে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ঠিক সেই বছরই হেমাঙ্গিনী দেবী লিখেছিলেন 'মনোরমা' গ্রন্থটি। কিন্তু তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে গ্রন্থটি ছাপার অযোগ্য জেনে লেখাটি তিনি ফেলে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৭৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সমাজের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চাপে মেয়েরা নিজেদের লেখা প্রকাশেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু নারীলেখিকা সম্পর্কে এত বিদ্বেষকে উপেক্ষা করেই স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস বিদেশেও সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর 'কাহাকে?' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ An unfinished song সম্পর্কে Westminister Gazatte লিখেছিল,

> Mrs Ghosal, as one of the pioneers of the women movement in Bengal, and fortunate in her own upbringing, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden's development.[৬৯]

স্বর্ণকুমারী পূর্বে কয়েকজন মহিলা লেখিকা উপন্যাসের খসড়া তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর জন্মের পূর্বে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশিত হয়। দীপ নির্ব্বাণ (১৮৭৬) প্রকাশের পূর্বেই মার্থা সৌদামিনি সিংহের 'নারীচরিত' নবীনকালী দেবীর 'কামিনী কলঙ্ক', হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' এবং সুরঙ্গিনী দেবীর 'তারাচরিত' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো সুদূর এবং বহুপ্রসারী লেখনী তার কোনো নারী সাহিত্যিকের ছিল না। মানসিকতার দিক দিয়েও তিনি সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। শিক্ষিত সচেতন মন নিয়ে তিনি তার রচনার মধ্য দিয়ে সমাজকে আলো দেখিয়েছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন—

> মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম পথ নির্দেশের কৃতিত্ব কাহার তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া কঠিন। তবে রচনার উৎকর্ষ এবং পরিমাণের দিক দিয়া এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।[৭০]

সমরেশ মজুমদার তাঁর স্বর্ণকুমারী উপন্যাসে নারীভাবনা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—

> তাঁর পূর্বে মহিলা লেখিকারা উপন্যাস রচনার প্রযত্ন করেছিলেন কিন্তু যে জীবনবোধ, মনস্তত্ত্বসম্মত দৃষ্টি, চরিত্রসমূহের অন্তর পর্যবেক্ষণ, সমাজ ও সময়ের পরিধি নিরূপণের তাৎপর্য উপলব্ধির প্রবণতা একজন রচনাকারকে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম সেই পুরোগামিতা সম্পূর্ণত স্বর্ণকুমারীর মধ্যেই দৃশ্য।[৭১]

মেয়েরা যখন লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাদের জন্য কোনো প্রশস্ত পথ তৈরি ছিল না। সংসারের দায়িত্ব পালন করে সকলের চোখ এড়িয়ে তাদের লিখতে হত। এভাবেই তো লিখেছিল রবীন্দ্রনাথের উমা, মৃণালেরা। জেন অস্টেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Pride and Prejudice লিখেছিলেন মুদি গোয়ালার হিসেবের খাতার নীচে নিজের লেখার খাতা লুকিয়ে রেখে। স্বর্ণকুমারীর পরবর্তীকালের সাহিত্যিক লীলা মজুমদার তাঁর সংসারজীবনের শুরুর দিনগুলি সম্পর্কে বলেছেন—

> বেশি লেখা হয়ে উঠত না। আমার মতো মেয়েরা নানারকম সাংসারিক দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর অযত্ন করলে বিবেকও দংশন করে, আবার বাড়ির কেউও খুশি হয় না। খানিকটা দায়মুক্ত না হলে মেয়েদের পক্ষে কোনো সৃজনশীল কাজ করার পথে অনেক বাধা। বহু সম্ভাব্য প্রতিভাকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছি।[৭২]

তবে স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। স্বর্ণকুমারী নিজেই লিখেছেন—

> আমার পূজনীয় ও স্নেহময় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার জীবনব্রত উদযাপন করিবার জন্য যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তৎকালে হিন্দুবালিকাগণকে সেভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত না। তথাপি আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগত আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রেমপূর্ণ উপদেশ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্য জীবনের ঝাটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি। এবং যদিও আজ তিনি ইহজগতে বর্তমান নাই, তাঁহার কল্যাণময়ী শক্তি এখনও আমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় প্রভাব সঞ্চারিত করিতেছে, এবং প্রত্যেক বিপদের সময় তাহার সাহায্যকারী সবল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি এবং প্রত্যেক সাধু সংকল্পে তাঁহার সমর্থনসূচক উৎসাহবাণী শ্রবণ করিতেছি। সাহিত্যের প্রতি যে গভীর প্রেম তিনি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই আমাকে তৎকালীন সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানদ্যোতক মাসিক পত্রিকাগুলির অন্যতম ভারতী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং মানসিক স্বাধীনতার যে সুখের স্বাদ তিনি আমাকে উপভোগ করাইয়াছিলেন, তাহাই আমাকে আমার দেশবাসীগণের সহিত বর্তমান উন্নতিযুগের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশে সহযোগিতা ও বিস্তারসাধনে সহায়তা করিতে উদ্দীপ্ত করিয়াছে।[৭৩]

ঘরে বাইরে যে সংস্কারমুখী পরিবেশ ছিল তার প্রভাব তাঁর সাহিত্যজীবনের ভিত্তি গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছিল। তাঁর লেখনীর মধ্যে সমকালীন সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকায়। বোঝা যায় 'ভারতী'

> কোনো অর্থেই মেয়েদের কাগজ না হলেও সম্পাদিকার মানস চোখের সামনে পাঠকদের থেকে পাঠিকাদের উপস্থিতিই ছিল জোরালো। পাঠিকাদের দিকে তাকিয়েই তিনি 'একটি প্রস্তাব' প্রবন্ধে 'সখীসমিতি'র মতো মেয়েদের সমিতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। 'সখীসমিতি'র নানা খবরাখবর যে 'ভারতী'তে ছাপানো হত, সেও তো পাঠিকাদের দিকে তাকিয়েই। শুধু তাই নয়, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' উনিশ শতকে নারী আলোচনায় যুগান্তর নিয়ে এসেছিল বলা যায়। নারী-পুরুষের ক্ষমতা-সমতা নিয়ে পশ্চিমদেশে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আসরে তাকে হাজির করা হল স্বর্ণকুমারী 'ভারতী'রই পাতাতে। স্বর্ণকুমারীর নিজের লেখা 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' কিংবা কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' সে যুগের পটভূমিতে রীতিমত বৈপ্লবিক। ঠাকুরবাড়ির একজন সদস্য হিসেবেই তিনি ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা 'ভারতী'র দায়িত্বভার নিয়েছিলেন, মেয়েদের বিশেষভাবে কোনো কিছু করবার জন্য নয়। তবু সেই সঙ্গে 'বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতি' পরিবর্তনের দায় তিনি অনেকটাই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সম্পাদনার মাধ্যমে।[৭৪]

বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অসহায় মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মেয়েদের সক্ষম করে তুলতে তিনি 'সখিসমিতি' (১২৯৭) স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য 'সখিসমিতি'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। ১২৯৫ সালের ১৫ পৌষ সখিসমিতির উদ্যোগে প্রথম মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার ক্রেতা-বিক্রেতা-দর্শক সকলেই ছিলেন মহিলা।

> অন্তঃপুর মহিলাগণের হৃদয়-মনের প্রসারতা সম্পাদন এবং তাহাদের শিল্পোন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্ত্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই, আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর, কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্পনৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর মহিলাগণের নিকট 'মহিলা শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতি বৎসর ইহার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখিসমিতির'র ভাণ্ডারে যাইত।[৭৫]

ঠাকুরবাড়ির-সংস্কারমুখী পরিবেশ স্বর্ণকুমারীর যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তিনি মেয়েদের বেদনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন মেয়েদের মধ্যে আত্মশক্তি জেগে উঠুক।

> সাহিত্যিকের কলম হাতে তুলে নিয়ে চেয়ে দেখেছিলেন সেকালের বাঙালি মেয়ের আলোহীন, অধিকারহীন, সাহসহীন মূঢ় ম্লান মুখ, বাল্যবিবাহ-বিধবাবিবাহ

> বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে পুরুষসমাজের তুমুল আন্দোলন, অনুভব করেছিলেন রক্ষণশীলতার, দীর্ঘলালিত সংস্কারের, প্রথাবদ্ধতার প্রতাপ— তাঁর নিয়ত জাগ্রত মননের প্রতিক্রিয়া ধরা দিয়েছিল তাঁর প্রবন্ধমালায়। তাঁর সচেতন মানসের স্বাক্ষর রূপ নিয়েছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসে।[৭৬]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তখনও নারীর মানবী পরিচয় গড়ে ওঠেনি। নারী বিষয়ে নানা জটিলতা দানা বেঁধে উঠছিল তখন। তার কারণ হল পূর্বে সমাজে মেয়েদের কোনো নিজস্ব পরিসর ছিল না। ফলে আত্মমর্যাদা এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি সমাজকে। উনিশ শতকের নবচেতনায় নারীকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের নারীপ্রতিমার রূপান্তর হল নবযুগচেতনায়। নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এই জীবনসমস্যাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সমকালীন সমাজকে নানাদিক দিয়ে বিচার করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের হৃদয়হীনতাকে তুলে দেখিয়েছেন তিনি। কুমারী এবং বিধবা এই দুই অবস্থান থেকে মেয়েদের জীবনকে নিরীক্ষণ করেছিলেন লেখিকা। কেট মিলেটের Sexual politics গ্রন্থে যে লিঙ্গগত রাজনীতির কথা বলেছেন তার চেহারাকে উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন তিনি। বিধবা নারীর পরিবারের অভ্যন্তরে সামাজিক নিরাপত্তা যে অর্থহীন তা স্বর্ণকুমারীর মত আর কেউ দেখেনি। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার, নারী পুরুষের সমতা, বিধবা সমস্যা, আধুনিক শিক্ষিত নারীর নিজের নির্বাচিত পাত্রে বিবাহ বাসনা প্রভৃতি ভাবনা তাঁর সমকালের পক্ষে কম ছিল না। নারীর মনস্তাত্ত্বিক রহস্য বিশ্লেষণে তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং বাস্তব চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা ও সংস্কারকে মেয়েরা যে অস্বীকার করতে চাইতো তিনি 'কাহাকে?' উপন্যাসের মৃণালিনীর মধ্যে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে শৈশব থেকেই মেয়েরা লিঙ্গ বিভাজনের শিকার এই নিষ্ঠুর সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে। মেয়েদের সুরক্ষার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন এই আধুনিক ভাবনারও উল্লেখ রয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

বিংশ শতাব্দীতে লেখা ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' এবং 'মিলনরাত্রি'তে স্বর্ণকুমারী সমাজ নির্ধারিত সীমারেখাকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী ভালো স্ত্রী এবং ভালো মা হওয়ার আদর্শগত অভিধাকে অতিক্রম করে বিকশিত হয়ে উঠেছে স্বদেশমন্ত্রে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে নারীচরিত্র সম্পর্কে নিস্তারিনী দেবী লিখেছেন—

> তাহার রচিত নারীগুলি এক মহিমাময়ী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাহারা রমণী বলিয়া যে ধূলি অবনত, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানের তেজ, নারীত্বের গর্ব এবং অন্তরের একটি শক্তি আছে।[৭৭]

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে বৃহৎ সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তা এবং মানসিকতায় তাঁর পরবর্তীকালের অনেক মহিলা লেখিকাদের থেকেও তিনি এগিয়ে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমসময়ের লেখিকা হয়েও নিজ স্বাতন্ত্র্য তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সমকালীন নারী আন্দোলনে

স্বর্ণকুমারীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। 'সখিসমিতি'র কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি মেয়েদের সজাগ করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই সচেতনতাই ভাষা পেয়েছে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে। সুদক্ষিণা ঘোষ তাই বলেছেন,

> স্বর্ণকুমারী তো সেই যুগের মেয়ে যাদের 'শক্তিতে আর ইচ্ছায়' মিল হয় না, মিল হয় না 'ব্যথায় আর বুদ্ধিতে'। স্বর্ণকুমারী দেবীর সারাজীবনের সাহিত্যচর্চায় আছে সেই যুগের বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা ...।[৭৮]

তথ্যসূত্র ঃ

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ১৪১

২. বসু রাজশ্রী, চক্রবর্তী বাসবী, সম্পাদনা, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, ঊর্বী প্রকাশন কলকাতা ৭০০০১৪, পৃষ্ঠা ৮৩

৩. বেগম মালেকা, বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১৯

৪. বসু স্বপন, বাংলায় নবচেতনায় ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৫৪

৫. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ১০১

৬. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৪২

৭. কবিরাজ নরহরি, সম্পাদনা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা ৭০০০১২, পৃষ্ঠা ১১৭

৮. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ৭৩

৯. বসু স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১২৩

১০. চন্দ পুলক, সম্পাদনা নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ৭৫

১১. বসু স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১৩৮

১২. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ৮১

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১২

১৪. শাশমল পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৫৪

১৫. ভট্টাচার্য সুতপা, সংকলন ও সম্পাদনা, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ১৭৩

১৬. শাশমল পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ২৯

১৭. বেগম মালেকা, বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৩৮

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩০

১৯. শাশমল পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ৪৩

২০. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২

২১. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২

২২. বেগম মালেকা, বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১৫

২৩. বসু স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১৬৬

২৪. বসু স্বপন, চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ, সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ২০১

২৫. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১০৬

২৬. মুরশিদ গোলাম, নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা ১৪৬

২৭. চট্টোপাধ্যায় মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুভাব, কলকাতা-৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ৩০

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩০

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২৯

৩০. শাশমল পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১৪

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু, সম্পাদনা, মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃষ্ঠা ৬৮৮

৩২. ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৩৬

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৪

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০

৩৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৮৮

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৯১

৩৮. দে সত্যব্রত, চর্যাগীতি পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯, পৃষ্ঠা ১২৭

৩৯. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৯৩

৪০. বন্দ্যোপাধ্যায় রণজিৎ, উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯১

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩

৪২. ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১১৪

৪৩. চক্রবর্তী সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১৯৮

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯

৪৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১১০
৪৬. দত্ত মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, পৃষ্ঠা ৯
৪৭. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপড়ি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১১৭
৪৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা ১৬৪
৪৯. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১০০
৫০. ভট্টাচার্য সুতপা, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, সম্পাদনা, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১১০০০১, পৃষ্ঠা ২১
৫১. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদনা, ইকোফেমিনিজম ঃ্ব পরমা প্রকৃতিবাদ, হাওড়া ৪৯, বি. ২৪ ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭০, পৃষ্ঠা ১০০
৫২. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ১৬৩
৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৩
৫৪. ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১১৪
৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৪
৫৬. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ১৭২
৫৭. আজাদ হুমায়ুন, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা ৩০২
৫৮. চন্দ পুলক, সম্পাদনা, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা ১৭৩
৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩
৬০. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৬
৬১. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৬
৬২. আজাদ হুমায়ুন, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা ৩১১
৬৩. ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাস মেয়েদের কথা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১০
৬৪. শাশমল পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃষ্ঠা ১৪৯
৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৮
৬৬. চন্দ রানী, আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃষ্ঠা ৪১
৬৭. দেব চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৪৮
৬৮. বাগল যোগেশচন্দ্র, সম্পাদিত, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৪৮
৬৯. দেবী স্বর্ণকুমারী, কাহাকে? (ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৪
৭০. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ২৮৩
৭১. সরকার পুলককুমার, শুভশ্রী, ৭ রামবাবু লেন (নতুন বাজার), বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা ২৪

৭২. ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাস মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১১

৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫১২

৭৪. ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১৪৬

৭৫. সেন অভিজিৎ, ভাদুড়ী অনিন্দিতা (সংকলন), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১২

৭৬. সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), শুভশ্রী, ৭, রামবাবু লেন, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০৩, পৃষ্ঠা ২৫

৭৭. বসু রাজশ্রী, চক্রবর্তী বাসবী, সম্পাদনা, প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃষ্ঠা ২৩৬

৭৮. ঘোষ সুদক্ষিণা, মৃণালের কলম, প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০০০৪, পৃষ্ঠা ২৪।